ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

ভাওয়াইয়া ও ভাওয়াইয়া গানে নদী প্রসঙ্গ

মঈন উদ্দীন আহমেদ*

সারসংক্ষেপ: বঙ্গভূমির আঞ্চলিক গানগুলোর মধ্যে ভাওয়াইয়া অন্যতম। এই গানের মোহনীয় সুর-তাল-লয়ে শ্রোতা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে ক্ষণিকেই। ভাওয়াইয়া গান, গানের ধরন, বিষয়বস্তু প্রভৃতি নিয়ে বিস্তর লেখা রয়েছে। এ রচনায় সে সম্পর্কিত আলোচনা চর্বিত-চর্বণের মতোই। বিভিন্ন বিষয়ের ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে পাঠকের কম-বেশি পরিচিতিও রয়েছে। তবে এ ধারার গানের সমৃদ্ধ সংগ্রহ থেকে শুধু নদী-সম্পর্কিত কিছু গান নিয়ে এই আলোচনা পাঠকের দৃষ্টি কেবল নতুনতর দৃশ্যপটে নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মাত্র।

ক. নামকরণ:

ভাওয়াইয়া মূলত প্রেমের গান। প্রেমভাব নিয়ে রচিত বিরহ বা বিচ্ছেদজাত করুণ, উদাস সুরের মর্মস্পর্শী গান ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত। সাধারণভাবে 'ভাব' থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে— এমনটি বলা হয়। ভাব শব্দের আভিধানিক অর্থ— প্রকৃতি, স্বভাব, ধরন, মর্ম, প্রীতি, প্রণয় ইত্যাদি। রংপুর-দিনাজপুরে শব্দটির আঞ্চলিক উচ্চারণ— ভাও। যার অর্থ— নিয়ম বা কায়দা, দিক, আপস (তারার ভাও হয়ে গেইচে) প্রভৃতি। ভাবজাত ভাও শব্দের সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ভাওয়াইয়া' শব্দ গঠিত হয়েছে। প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটির অর্থ হলো— যে ভাবে কিংবা যে ভাবায়। অনেকটা যে নৌকা বায়— নাইয়া, গাঁয়ের মানুষ— গাঁইয়া, যে খায়— খাওয়াইয়া'র মতো। শব্দটির রূপগত অর্থ করা যায়— যে ভাবে বা ভাবায়, সেই ভাবুকের গান। অন্যভাবে বলা যায়— ভাবপূর্ণ যে গান মানুষকে বিহ্বল করে, তাই ভাওয়াইয়া। স্থানবাচক 'ভাওয়া'-এর সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যোগে ভাওয়াইয়া হয়েছে বলেও মত প্রচলিত আছে। ভাওয়া অর্থ— নদীর চর, কিংবা এলুয়া-কাশিয়া-নলখাগড়ায়ুক্ত জলাভূমি। যে জলাভূমি মহিষের উপযুক্ত চারণক্ষেত্র। ঋতুবিশেষে যেখানে বাথান করে মহিষপালক তথা মহিষাল বা মইষাল মহিষ চরায়। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী ড. সুখবিলাস বর্মা লিখেছেন, মাসের পর মাস মহিষ চরানোর সময়ে মইষালেরা দোতরা বাজিয়ে করত এই গান। ভাওয়া থেকে এ গান ভেসে আসত পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে। তাই এই গানের নাম হয়েছে ভাওয়াইয়া।[১] উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা লোকসঙ্গীতবিদ ড. হরিপদ চক্রবর্তী ভাওয়াইয়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে— 'ভাটি' থেকে ভাটিয়ালি গান, নৌকার মাঝিদের গান। আর 'ভাওয়া' থেকে ভাওয়াইয়া গান, মইষাল-রাখালদের গান। 'আলি' 'ইয়া' প্রত্যয় দু'টি সম্পর্কিত, সম্বন্ধযুক্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাটির সম্পর্কিত বা সম্বন্ধযুক্ত ভাটিয়ালি আর ভাওয়া'র সঙ্গে সম্পর্কিত ভাওয়াইয়া।[২] অনেকে আবার বাতাস শব্দজাত 'বাও'-এর সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যোগে বাওয়াইয়া>ভাওয়াইয়া ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, বাওয়াইয়া বা ভাওয়াইয়া বায়ুবাহিত গান। অর্থাৎ মাঠে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে গাওয়া এমন গানের সুর বাও

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বা বাতাসে ভেসে লোকালয়ে আসত বলে নামকরণ হয়েছে— ভাওয়াইয়া। আব্বাসউদ্দীন আহমদ বলেন, ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ। উদার হাওয়ার মতো এর সুরের গতি, তাই এর নাম ভাওয়াইয়া।[৩] আরেকটি প্রচলিত মত অনুযায়ী 'বাউদিয়া' শব্দ থেকে ভাওয়াইয়া হয়েছে। বাউদিয়া অর্থ— ছন্নছাড়া। বাউলদের মতো সংসার বিমুখ, ছন্নছাড়া, আধ্যাত্মপ্রেমে উন্মাদ বাউদিয়া সাধক সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক গান ভাওয়াইয়া।

ভাওয়াইয়া নামকরণ নিয়ে উপর্যুক্ত মতের সবগুলিই গ্রহণীয়। অবশ্য ড. হরিপদ চক্রবর্তীর অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ভাওয়াইয়া ছাড়াও উত্তরবঙ্গের মানুষ গানের নায়ককে প্রাধান্য দিয়ে স্থান বিশেষে 'মাহুত বন্ধুর গান', 'মইষাল বন্ধুর গান', 'গাড়িয়াল বন্ধুর গান', 'কানাই-এর গান', 'নাইয়ার গান', 'সাধুর (বানিয়া) গান', 'নাথের (স্বামী) গান' প্রভৃতি স্থানীয় নাম ব্যবহার করত। দূরবর্তী ধূ-ধূ পাথারে (প্রান্তর) গীত হতো বলে 'পাথারিয়া গান', আর ভাওয়াইয়া গানের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র দোতরার নামে 'দোতরার গান' নাম দু'টিও প্রচলিত ছিল। ব্যক্তি-বস্তু-স্থান প্রভাবিত এরূপ বিভিন্ন নামকরণ হলেও গানের বিষয়বস্তু অভিন্ন— নর-নারীর প্রেম। আর প্রেম প্রকাশের ভাষা, সুরও অভিন্ন। আঙ্গিকগত ঐক্যও বিদ্যমান। পরবর্তী সময়ে যখন একটি অভিন্ন নামের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন গানের মৌলিক বিষয় প্রেমভাবের প্রাধান্য থেকে ভাববাচক ভাওয়াইয়া শব্দটি নির্বাচন করা হয়। সে দিক বিবেচনায় 'ভাব' থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে— এমনটি বলাই বোধ হয় বেশি যুক্তিযুক্ত।

খ. উদ্ভব-বিকাশ

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক গান। আঞ্চলিকতার দিক থেকে ভাটিয়ালির একেবারে বিপরীতে এর অবস্থান। বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, উত্তরাঞ্চলীয় কোচবিহার, আসামের ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলগুলির মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের উদ্ভব, বিস্তার ও জনপ্রিয়তা। এ গানের ভাব-ভাষা-সুরের সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের জনজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের সুরমাধুর্য আর ভাব-বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এর উৎপত্তি কিংবা প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো বিশেষজ্ঞ মত নেই। তবে ভাওয়াইয়া গান যে যথেষ্ট প্রাচীন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যে প্রেমের প্রাচীনত্ব বিচারে ভাটিয়ালিকে বাউল গানের থেকেও প্রাচীন বলা হয়— ভাওয়াইয়াতে সে প্রেমেরই প্রকাশ লক্ষণীয়। কোনো কোনো ভাটিয়ালি গানের বিরহী-নারীর বক্তব্যের সুর যেন ভাওয়াইয়ায় হুবহু উচ্চারিত হয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃ.) যুগান্তকারী আগমনে বৈষ্ণব মহাজনরা যে পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে মানবীয় প্রেম-মাধুর্যে উদ্ভাসিত করেছিলেন, ভাওয়াইয়া গানের ভাবে, ভাষায় তার প্রভাব লক্ষণীয়। এর থেকে ভাওয়াইয়া গানের উদ্ভব বৈষ্ণব পদাবলির সময়কালে সূচিত হয়েছিল— এমনটি বলা অযৌক্তিক হবে না। অবশ্য এ গানের জন্ম কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা হয়নি; লোকসঙ্গীতে এমনটি হয়ও না। লোকসঙ্গীতের উদ্ভব ব্যক্তি-মন থেকে সমাজ-মনে ব্যাপ্তি ঘটায়; তার প্রচার-প্রসার-স্থায়িত্ব

নির্ভর করে লোক-সমাজের জীবন-জীবিকা, ভূ-প্রকৃতির অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা বিশেষের উপর। ভাওয়াইয়া ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি নয়; গোষ্ঠী মননের অভিব্যক্তি। বলা যায় Folk cmmunity'র অবদান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা প্রধানত এই গানের স্রষ্টা, ধারক ও বাহক। যারা পূর্বে কামরূপের কোচ গোত্রভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে কোচদের একটি অংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এবং কোচ রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের 'রাজবংশী' বলে পরিচয় দেয়। আরেকটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করে 'কেওট রাজবংশী' নামে পরিচিতি পায়। প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী-গবেষক ড. সুখবিলাস বর্মা ভাওয়াইয়া গানের উদ্ভব-বিকাশে রাজবংশীদের পাশাপাশি অন্যদেরও উল্লেখ করেছেন,

> ভাওয়াইয়া যে অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত সেই প্রাচীন কামরূপের মূল জনগোষ্ঠী রাজবংশী এবং এ অঞ্চল রাজবংশী সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট। এ কথা বলা প্রয়োজন যে শুধু রাজবংশী নন, এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, খেনু, যোগী, ধোপা, কোচ, মেচ, রাভা, মুসলমান সকলেই মূল রাজবংশী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উল্লিখিত অঞ্চলের মানুষজন (মূলত রাজবংশী) তাদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ, তাদের শিল্পবোধ, অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, নদী, অঞ্চলের ভাষা– সব কিছুর মধ্যে উৎপত্তি হয়েছে এই ভাওয়াইয়া।[৪]

কোচ ও রাজবংশী উভয়ই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভুক্ত ছিল। ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু কিংবা মুসলমান হওয়ার পর তারা ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করে। তবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের স্মৃতি ও সংস্কার নিয়েই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা ভাওয়াইয়া গান রচনায় ব্রতী হয়। হয়তো বা এ কারণেই পুরুষেরা গানের রচয়িতা, নায়ক-গায়ক হলেও খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যতিরেকে প্রায় সব গানে পুরুষের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে নারীর হৃদয়-গাথা, যা নারীপ্রেমের এক স্পর্ধিত স্পন্দন। যা ভাওয়াইয়া গানেরও এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

শাস্ত্র-ধর্ম প্রভাবিত সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর আড়ালে ভাওয়াইয়া দীর্ঘকাল লোকালয়ের বাইরে অরণ্যে-বাথানে-পথে-প্রান্তরে-নদীবক্ষে চর্চিত-গীত হয়েছে। উনিশ শতক পর্যন্ত এ গানের চর্চা এর ধারক-বাহকশ্রেণি তথা মাহুত, মইষাল, রাখাল, গাড়িয়াল, বাউদিয়া, নাইয়া, শিকারী প্রভৃতি নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ গানের প্রতি সঙ্গীতানুরাগী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তাঁরা গান সংগ্রহ ও আলোচনা করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করেন। একদা যে সঙ্গীত লোকালয়ে গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেই সঙ্গীত নিষিদ্ধতার প্রাচীর ডিঙিয়ে ক্রমশ প্রবেশ করে লোক-সমাজের অন্দরে অন্দরে; অনুরণিত হতে থাকে উত্তরবঙ্গের আপামর গণ-মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সাহিত্য সংগঠন 'রংপুর-সাহিত্য পরিষৎ' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর পরই উল্লেখ করতে হয়— কোচবিহারে জন্ম নেয়া স্বনামধন্য দুই কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯ খৃ.) ও সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার (১৯০৬-১৯৭০ খৃ.) নাম। যাঁরা গান গেয়ে, গ্রামোফোনে রেকর্ড করে ভাওয়াইয়া গানকে বাংলার আনাচে-কানাচে, দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেন। বিশেষত আব্বাসউদ্দীন আহমদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই ভাওয়াইয়া ছাড়পত্র পায় লোকজীবন থেকে নাগরিক জীবনে উত্তরণের। উল্লেখ্য, গ্রামোফোন রেকর্ডে গানের প্রতিষ্ঠাপর্বে কোচবিহারের

আরো কতিপয় শিল্পীর অসামান্য অবদান ছিল। তাঁদের অন্যতম হলেন— নায়েব আলী টেপু, কেশব বর্মণ, ধীরেন চন্দ্র প্রমুখ। বিভাগোত্তর সময়ে বেতার-দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচার-প্রসারে ভাওয়াইয়া নতুন মাত্রা পায়। আব্বাস-পুত্র মুস্তাফা জামান আব্বাসী, কন্যা ফেরদৌসী রহমান, ভ্রাতুষ্পুত্রী রোকসানা করিম, রংপুরের হরলাল রায়, তদীয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ রায়, নীনা হামিদ, নাদিরা বেগমসহ বহু শিল্পীর অবদানে ভাওয়াইয়ার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। একসময় তা বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর নানা দেশের কোটি কোটি সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয়-সঙ্গীতে পরিণত হয়।

গ. শ্রেণিকরণ

ভাওয়াইয়া বিলম্বিত লয়ের গান। আবার এ গান দ্রুতলয়ে গাওয়ার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য ভাওয়াইয়া বিশারদগণ সুর-তালের পার্থক্য বিচারে একে প্রধানত দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এক. দীর্ঘ সুরসম্পন্ন ভাওয়াইয়া, দুই. হ্রস্ব সুরসম্পন্ন চটকা জাতীয় ভাওয়াইয়া। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪ খৃ.) চটকাকে কখনো ভাওয়াইয়ার অংশ, কখনো পৃথক শ্রেণির গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন— ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অধঃপতিত রূপের গান চটকা, ইহা তালপ্রধান সুরে রচিত। দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত লঘু বিষয় ইহার অবলম্বন।[৫] সুর ও ভাবের তারতম্য বিচারে কেউ আবার ভাওয়াইয়াকে ক. চিতান খ. ক্ষীরল গ. দরিয়া ও দীঘলনাসা ঘ. গড়ান ও ঙ. মইষালি -এ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন। চিতান ভাওয়াইয়া— বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ার গান। সাধারণত এই গান উচ্চগ্রাম থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ নিম্নগ্রামে নামে। ক্ষীরল নদীর নামকরণে ক্ষীরল ভাওয়াইয়া। এ শ্রেণির গানে দোতারা বাজানোর একটি বিশেষ ধরন আছে, যাকে 'ক্ষীরল ডাং' বলে। এই গান কিছুটা নিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে পরে উচ্চগ্রামে উঠে। 'দরিয়া'-নদী, 'দীঘলনাসা'<দীর্ঘনাসিকা— দীর্ঘ টানা সুরের গান। এরূপ নামকরণ বোধ হয় সে জন্যই। দম-সাপেক্ষে সুর— যেন স্রোতের টানে ভাসিয়ে দেওয়ার সুর। গড়িয়ে চলার ভাব অর্থে 'গড়ান' শব্দ। যেন বিরহকাতর নারীর ধুলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা। মহিষ+আলি>মইষালি মইষালের কণ্ঠের গান। অন্যান্য ভাওয়াইয়া গানের মতো হলেও এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোনো বাহনে সোয়ার হয়ে চলেছে। চলার ছন্দ প্রকাশ পায় গানের ছন্দে। এই চালকে সোয়ারি চাল বা মইষালি চাল বলে। লোকসাহিত্য গবেষক সামীয়ূল ইসলাম দীর্ঘ সুরের ভাওয়াইয়া ও হ্রস্ব সুরের চটকা জাতীয় ভাওয়াইয়ার সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি হিসেবে ক্ষীরল গানের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত দুই শ্রেণির সুরের মাঝামাঝি ক্ষীরলের সুরগত অবস্থান। দীর্ঘ সুরের ভাওয়াইয়া গানের মতো এর সুর কিছুটা টানা, তবে সেখানে মাঝে মাঝে যে সুরভঙ্গ ঘটে, ক্ষীরলে তা নেই। শিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মণ্ডলের মতে— যে সমস্ত গানে ক্ষীরল নদীর উল্লেখ থাকত, সেগুলিই ক্ষীরল গান বলে অভিহিত হত। কিন্তু বর্তমানে ঐ গানের নির্দিষ্ট সুরে গীত গানকেই কেবল ক্ষীরল বলা হয়। তিনি বলেন— ক্ষীরল সুরের এমন একটা প্রাণ মাতানো উদাস করা ভাব আছে তাহা যাঁহারা গভীর রাত্রে অথবা বর্ষায় নদীবক্ষে এই গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।[৬] সুরতাত্ত্বিক নির্মল দাস সুরের বিন্যাস অনুসারে ভাওয়াইয়া

গান 'দরিয়া অঙ্গ' ও 'ক্ষীরল অঙ্গ'— এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে— চিতান, দীঘলনাসা ও গড়ান দরিয়া অঙ্গের এবং মইষালি, গাড়িয়াল গান ক্ষীরল অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। নির্মল দাস ক্ষীরল গানকে ভাওয়াইয়ার প্রকারভেদ ধরেই সুর, তাল, লয়, ছন্দের বিশিষ্টতা অনুযায়ী এরূপ শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।[৭]

মানবিক প্রেমভাব, সুরবিন্যাস, বাক্যবন্ধ, উচ্চারণভঙ্গী, সর্বোপরি গায়কী ঢঙের ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। বাহারি, মনোরঞ্জক চটকদার বিষয় নিয়ে রচিত গান– চটকা। নর-নারীর লঘু ও অশ্লীল বিষয় থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের নানা চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। এতে রঙ্গ-রসিকতা ও আনন্দ-বিনোদনের আবেদন লক্ষ্য করা যায়। ভাওয়াইয়া গানে ভাবের গভীরতা ও সুরের মাদকতা আছে। চটকা চটুল ভাব ও ভাঁজহীন লঘু সুরের গান। ভাওয়াইয়া গানে বিরহজনিত প্রেমের বেদনা-হতাশা প্রকাশ পায়। চটকায় মিলনাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রেমের আর্তি-আকুলতা প্রতিফলন ঘটে। ভাওয়াইয়া একক কণ্ঠের গান, কিন্তু চটকা একক, দ্বৈত উভয় কণ্ঠেই গীত হয়।

ঘ. ভাব ও বিষয়

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়— নর-নারীর প্রেম; যে প্রেম একান্তই লৌকিক, জীবনাশ্রয়ী। উল্লেখ্য, প্রায় সব গান নারী-হৃদয়ের আর্তি তথা প্রেমবাসনা, মিলনাকাঙ্ক্ষা, বিরহযাতনা প্রভৃতি ভাব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। ভাটিয়ালির কিছু গানে নদীচারী মাঝির জন্য বিরহী নারীর ক্রন্দন দেখা যায়। কিন্তু ভাওয়াইয়ায় নাইয়া-মাঝিসহ মাহুত, মইষাল, রাখাল, গাড়িয়াল, বানিয়া (সাধু), শিকারী, বৈদ্য, বাউদিয়া, চেংড়া বন্ধু, বৈদেশি বন্ধু ইত্যাদি শ্রেণি-পেশার নামহীন মানুষ নামহীন কোনো গ্রামীণ যুবতির দয়িত। যৌবন ভারাক্রান্ত যুবতি যাদের প্রেম দিতে চায়, যাদের নিকট থেকে প্রেম পেতে চায়। এদের সম্বোধন করে গান গাওয়া হয়েছে। সাংসারিক কাজের ফাঁকে গোপনে, আড়ালে-আবডালে এদের সঙ্গে পল্লি-বালার সাক্ষাৎ হয়, প্রেম হয়। চোখের আড়াল হলে হৃদয়ে বেদনা জাগে। ভাওয়াইয়া গানে এমন প্রেমেরই অকপট স্বীকৃতি, নিরাভরণ প্রকাশ রয়েছে। গানের নায়কেরা বিচিত্র পেশায় যুক্ত। তারা গানের রচয়িতা; আবার গায়কও। কিন্তু গানে সম্পূর্ণ নারীহৃদয়ের কথার প্রতিফলন লক্ষণীয়। পুরুষের কণ্ঠে নারীর প্রেম বৈষ্ণব কবিদের কণ্ঠে রাধার প্রেমের কথাই স্মরণ করায়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভাবিত সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথায় আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছিল। পদাবলিতে তাঁরা রাধার অন্তর্বেদনার কথা একেবারে মর্ত্যবাসী কোনো নারীর কথা করে তুলে ধরেছিলেন। ভাওয়াইয়া গানের পুরুষ কবিরাও তেমন তুলে ধরেছেন প্রেমার্ত পল্লিবালার বেদনার্ত হৃদয়-গাথা। বিবাহপূর্ব প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, বিবাহোত্তর স্বামীর সান্নিধ্য-মিলন বাসনা কিংবা পরকীয় প্রেম, বৈধব্যজীবনে প্রেম-বঞ্চনা, পারিবারিক দুঃখ-কষ্ট, এমনকি নারী নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ে গানগুলি রচিত হয়েছে। নারীর সম্বোধনে 'কালা' বা 'কানাই' আছে। তবে এ কানাই ব্রজের কৃষ্ণ নন, বাংলারই কোনো পল্লিযুবক। প্রতীক হিসেবে বগা-বগী, বাওই, কোড়া, কুরুয়া, কোকিল, ভ্রমর ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে পাখি কিংবা নদী-পানি,

ফুল-ফল প্রভৃতি লোকমানসে প্রেমের সহচর-অনুচর শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে— যা একান্তই নৈর্ব্যক্তিক। লোকসাহিত্যে ব্যক্তি অনুপস্থিত; এমন নৈর্ব্যক্তিক প্রতীকী শব্দ দিয়ে সমষ্টির আবেগ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে— পুরুষই ভাওয়াইয়া গানের রচয়িতা ও গায়ক। কিন্তু গানে নারী-হৃদয়ের আর্তির প্রতিফলন। যে নারী গ্রাম-বাংলার কোনো যুবতি, বধূ কিংবা বিধবা। জীবিকার প্রয়োজনে মাহুত হাতির জন্য যায় অরণ্যে, মইষালকে যেতে হয় বাথানে, রাখাল গরুর পাল নেয় মাঠে, গাড়িয়াল গাড়ি নিয়ে যায় দূর গঞ্জে, বানিয়া যায় দূর শহরে, নাইয়া যায় এক ঘাট থেকে দূর বন্দরের আরেক ঘাটে। ঘরে রেখে আসা ঘরনি কিংবা গ্রামে ফেলে আসা প্রেয়সী— সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছেদ-বেদনায় ভরে ওঠে মন। অবসর সময়ে সেই বেদনা তাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সুর হয়ে। বলা যায়— গান রচনা-চর্চায় নারীর কোনো ভূমিকা নেই; একচ্ছত্র পুরুষের আধিপত্য। আর বিচিত্র পেশায় যুক্ত পুরুষের জীবন-জীবিকা গানের চিত্রকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরাই গানের নায়ক। লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে লোকজীবন, তার সমাজ ও পরিবেশের হৃদয়গ্রাহী চিত্র যে জাতির নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অসামান্য উপাদান উপকরণের গৌরব অর্জন করতে পারে ভাওয়াইয়ায় ব্যবহৃত মইষাল, গাড়িয়াল, বৈদ্য-শিকারী-নাইয়া প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শ্রেণির মানুষকে নায়ক চিহ্নিত করায় তার দৃষ্টান্ত মেলে।[৮] তবে গানে পুরুষের কণ্ঠে নারী-হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হওয়ার যে ব্যাপার, তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারক কোচ সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষ রাজবংশীরা ধর্মান্তরিত হয়ে এক সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের স্মৃতি বিস্মৃত হয়নি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার নিয়েই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় উল্লিখিত নায়ক-গায়ক-পুরুষেরা গান রচনায় ব্রতী হয়েছে। কৌমার্য প্রেম পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় সমর্থন করে না। আর অত্যন্ত মানবিক হওয়া সত্ত্বেও প্রেম জাগানিয়া, বিরহ ভাবানিয়া, মন উদাসীয়া গান লোকালয়ে নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, হিন্দু নারীদের জন্যও গানের বিষয় সীমাবদ্ধ ছিল রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণসহ অতিমানবিক পৌরাণিক নানা অনুষঙ্গের মধ্যে। ফলে নারীর কুলধর্ম রক্ষার জন্যই সরাসরি নারীর কণ্ঠে বিরহ-বেদনার কথা ব্যক্ত না করে পুরুষেরা নিজের কণ্ঠে তা ধ্বনিত করেছে। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর ঠিকানা হয়েছে অন্তঃপুরে। অন্যদিকে সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে দূরের মাঠে-ঘাটে, নির্জন প্রান্তরে গিয়ে ভাওয়াইয়া ভাবুকেরা গান গেয়েছে। গানের ভাবে-সুরে নিজেদের ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা একাকার হয়ে গেছে। হরিশচন্দ্র পাল লিখেছেন,

> ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, জাগ ইত্যাদি গান লোকালয়ে গাইবার প্রচলন ছিল না। কৃষিকাজের অবসরে দূর মাঠে ধূ-ধূ প্রান্তরে মহিষ চরাবার সময় কাশ ও নলখাগড়ার বনে লোকালয়ের বাইরেই এই গান গাওয়া হত। ঐ সময়ে লোকালয়ে দোতরা, ব্যানা, সারিন্দা বা বাঁশী বাজিয়ে গান গাওয়া ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র বাজানো সামাজিক আইন-কানুনে নিষিদ্ধ ছিল এবং অপরাধযোগ্য বলে বিবেচিত হত। ...কোনক্রমে এ-সংবাদ প্রকাশ পেলে তাদের লোক চোখে হেয় প্রতিপন্ন হতে হত এবং লোকে তাদের বাউদিয়া আখ্যা দিয়ে অপদস্থ করতো। জন সমাজের সহানুভূতি বঞ্চিত নিধুয়া পাথারের এই গায়কগণ একাধারে সঙ্গীত রচয়িতা, সুরদাতা ও শ্রোতা।[৯]

ভাওয়াইয়া গানের প্রসঙ্গ আলোচনায় উপর্যুক্ত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে যে গান পুরুষকেই দূরের মাঠে, নির্জন প্রান্তরে গিয়ে গাইতে হয়, সে গান অন্তঃপুরের নারীর কণ্ঠে আশা করা যায় না। এ দিক থেকে গানের ধারাটি বিলীন হওয়ার আশঙ্কা ছিল যদিও, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কেননা, পল্লিগায়কদের নিজেদের লব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত গানগুলির আবেদন ছিল প্রত্যক্ষ ও জীবনঘনিষ্ঠ, একান্তই মানবিক। গানের করুণ সুর-মূর্ছনা সরাসরি মানুষের মর্মলোক স্পর্শ করে, হৃদয় অভিভূত হয়। জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় এ ধারার গান জীবন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। উপরন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়ায় ও শিক্ষিত শ্রেণি কর্তৃক পোষকতা পাওয়ায় এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-গুণে ভাওয়াইয়া গান অবশেষে লোকগানের অতি জনপ্রিয় একটি ধারায় পরিণত হয়।

ঙ. ভাষা ও সুর

ভাওয়াইয়া গানের ভাষা এবং সুর বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। যদিও গানের ভাষা এবং সুরের তত্ত্বগত পরিচিতি তুলে ধরা উদ্দেশ্য নয়; খণ্ডিত হলেও ভাওয়াইয়ার নদী-কেন্দ্রিক গানের প্রসঙ্গ মুখ্য আলোচ্য। তবে সে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক কারণে। অন্যথায় মূল আলোচনার যথার্থ পরিস্ফুটন হবে না। এ কথা স্বীকার্য, একটি জনগোষ্ঠীর সমাজ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব, ভাষা প্রভৃতি বিষয় নিজেদের লোকসাহিত্যের মধ্যে নিহিত থাকে। এই অর্থে লোকসাহিত্যকে গণমানুষের বিশ্বস্ত দলিল বলা যায়। লোকসাহিত্যের অন্যতম শ্রেণি লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উত্তরাঞ্চলের মানুষের নিজস্ব ভাষার বহুল ব্যবহারে ভাওয়াইয়া গান লোকসঙ্গীতের ভুবনে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। বিশেষত কথ্যভাষার সার্থক প্রয়োগে এ গানের মৌলিকত্ব লক্ষণীয়। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা মূলত ‘রাজবংশী উপভাষা’। যাকে জর্জ গ্রিয়ার্সন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের বাংলা ভাষার পূর্বাঞ্চলীয় শাখার শ্রেণিভুক্ত মনে করেন। আর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাজবংশী ভাষাকে পাশ্চাত্য বিভাগের উদীচ্য উপশাখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন কালে এই ভাষাকেই কামরূপী-বরেন্দ্রী নামে অভিহিত করা হতো।[১০] ভাওয়াইয়া গানের ভাষায় ও সুরের কাঠামোয় উক্ত আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের উপভাষা তথা কথ্যভাষার যে সব বৈশিষ্ট্য শ্রুতিগ্রাহ্য হয়, সে সব গানের ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন—

- আদ্যাক্ষরে র-স্থলে অ এবং অ-স্থলে র, অনুরূপভাবে রা-স্থলে আ এবং আ-স্থলে রা, কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরিবর্তন করে উচ্চারণ। রইলো> অইলো; রাইতে আইসে> আইতে রাইসে; রাখিতাম> আকিতাম; লাল> নাল; নৌকা> লৌকা।
- ব্যঞ্জনবর্গের মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনির স্থলে ঐ বর্গের অল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনির উচ্চারণ। কাছে> কাচে; গিয়েছে> গেইচে; বন্ধু> বন্দু; দেখি> দ্যাকি।
- শব্দের আদি, মধ্য, অন্তে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। যৌবন> যৈবন; বিদেশ> বৈদ্যাশ; নতুন> নউতোন; বাপ-মা> বাপো-মাও।

- অপিনিহিতির প্রভাবে ই বা উ স্বরবর্ণ পূর্বেই উচ্চারিত হয়ে যাওয়া। বান্ধিয়াছে> বাইন্ধ্যাছে; নতুন> নউতোন।
- শব্দের আদিতে বা মধ্যে এ-এর উচ্চারণ এ্যা হওয়া। কেশ> ক্যাশ; খেওয়া> খ্যাওয়া; বিদেশ> বৈদ্যাশ।
- স্বরাগম, স্বরলোপ কিংবা শব্দের সংকোচন। ক্রন্দন> কান্দোন; মধ্যে> মইদ্দে; কোথায়> কোটে; পড়িল> পৈল; আমি> মুই; আমাকে> মোক; ভাসাইয়া> ভাসেয়া; খসাইয়া> খসেয়া।
- ক্রিয়ার অন্তে আনুনাসিক ং, ঁ-চন্দ্রবিন্দু, ঙ, ঞ ধ্বনির উচ্চারণ। বলছি> বলোং, বলোঁ; পার করছি> পার করিচোং; ছিলাম> ছিলুঁ; পাব> পাওঁ।
- বিভক্তি ব্যবহারে পরিবর্তন। কর্তায় ও, য়-এর ব্যবহার— বাপো মাও মোক না বুঝিয়া; কর্মে, অপাদানে ক-এর ব্যবহার— রাজার হস্তিক পার করিচোং; নদীক কিসের ভয়; অধিকরণে ত, তে, তি-এর ব্যবহার— বাড়িত আইলে; নদীর কাছাড়োত রে মোর হোগলা দেয়া বাড়ি; মনোতে মোর লক্ষ রে কথা।
- ক্রিয়াপদের শেষের ব ধ্বনি ম বা প-তে রূপান্তরিত হওয়া। লাগাইম্ দড়ি; যৈবন করিমো দান; আসিবেন> আসপেন।
- সম্বোধনে এবং অন্যান্য স্থানে রে-এর বহুল ব্যবহার। যেমন— ও কি কানাই রে; যৈবন করিমো দান রে।
- সম্মানার্থে আপনারা-এর পরিবর্তে তোমরা, কিন্তু ক্রিয়াপদে ন যুক্ত করে সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার। আবার তুমি-এর পরিবর্তে তুচ্ছার্থশব্দ তুই, কিন্তু ক্রিয়াপদে তুমি-এর সমমানের শব্দই ব্যবহার। তোমরা গেইলে কি আসিবেন বন্দু; ও তুই কেমন মজা পাও।
- সুরের ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বা অন্তে ঘোষবৎ হ-ধ্বনির আগম। হ-এর সূক্ষ্ম উচ্চারণ গানের সুরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। 'ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে' চরণটির উচ্চারণ হবে— ওহ কি ওহ বন্দু কাহজল ভোহমরা রে।
- বাক্যবন্ধে অব্যয় জাতীয় অতিরিক্ত না, বা, রে পদের ব্যবহার, যা গানের সুর ও ছন্দের প্রয়োজনে হয়ে থাকে। ভাতো না চড়েয়া, ভাতো না আন্দিয়া, ভাতো না বাড়িনু রে; ও কন্যা তোর বা কত ভরা; মনোতে মোর লক্ষ রে কথা; উড়িয়া যায় চকোয়া রে পঙ্খি।
- কিছু কিছু শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাছে অর্থে 'আগে'— কার বা আগে কওঁ; ভাটির নাইয়া বলোঁ তোমার আগে। জন্য অর্থে 'বাদে'— সোনা বন্দুর বাদে রে মোর কেমন করে গাও।
- কিছু শব্দগুচ্ছ ভাওয়াইয়া গানের নিজস্বতায় পরিণত হয়েছে। কাজল ভোমরা; কালা চান; চিকন কালা; সোনা বন্দু; উতাল পাতাল; দুস্কের জ্বালা; অসের যৈবন

ইত্যাদি। এরূপ শব্দগুচ্ছ ভাওয়াইয়ার কথামালায় একটি 'চিরায়ত ভাবমণ্ডল' রচনা করেছে। একে ভাওয়াইয়ার নিজস্ব 'গীতিভাষা' বলা যায়।[১১]

ভাওয়াইয়া গানের সুর করুণতম। এই করুণ সুরের মূর্ছনা শ্রোতার হৃদয়ে বেদনার প্রলেপ লাগায়। আব্বাসউদ্দীন আহমদ বলেন ভাওয়াইয়া গান শুনতে শুনতে মনে হয় কোথায় যেন কোন আকস্মিক বেদনায় আচমকা যায় সুর ছিঁড়ে— যা অব্যক্ত, যা প্রকাশের নয়, তাকে যেন আর প্রকাশ করা চলে না, তার কণ্ঠ আসে ভিজে— ইংরেজিতে বলতে গেলে Silence is more eloquent than speech, সুরের দিক দিয়ে এইটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।[১২] ভাওয়াইয়া গানের করুণ সুরের উৎস তার বিষয় ও পরিবেশ। গানের মুখ্য বিষয় প্রেম, কিন্তু নারীর বিরহ-বিচ্ছেদজনিত চিত্তদাহ ও হৃদয়ার্তির ওপরই জোর দেয়া হয়েছে। ফলে গানের ভাবে দেহগত আকর্ষণ থাকলেও মার্জিত রুচির উপস্থিতি বিদ্যমান। দীর্ঘ টানা সুর, সুরের মধ্যে ভাঁজ ও হ ধ্বনির সূক্ষ্ম উচ্চারণ ভাওয়াইয়া গানকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। শ্রীগোবিন্দ হালদার ভাটিয়ালির সঙ্গে ভাওয়াইয়ার তুলনামূলক আলোচনায় উভয় গান গাওয়ার রীতি ও সুর বিষয়ে বলেছেন— গায়কীর দিক দিয়ে ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। তবে ভাটিয়ালির সুর সম্পূর্ণ একটানা, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের মাঝে সুর ভাটিয়ালির ন্যায় টানা হলেও গাইবার পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। ভাওয়াইয়া গানে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙ্গে থমকিয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ভাওয়াইয়া গানে সুরের দিক দিয়ে এতে ভাটিয়ালি ও পাহাড়ী অধিবাসীদের গাইবার রীতির সম্মিলিত প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়।[১৩] উত্তরাঞ্চলের তরাইভূমি, পাদদেশে অরণ্য, জলা-জঙ্গলা নিম্নভূমি, খরস্রোতা নদী, নদীর চর, অনাবাদী প্রান্তর, দীর্ঘ পথ ইত্যাদি গানের একেক নায়কের একেক পরিবেশ। প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিকার প্রয়োজনে তারা সেখানে গমন করে। লোকালয় থেকে দূরে উন্মুক্ত প্রকৃতি, অলস প্রহর, নির্জনতা তাদের মনে যে একাকিত্ব ও বিষণ্নতা সঞ্চার করে তারই প্রভাব পড়ে গানের সুরের উপর। একজন বিশেষজ্ঞ ভাওয়াইয়া গানের সুরে 'অদ্ভুত বন্য বিষণ্ন মাদকতা' আছে বলে উল্লেখ করেন।[১৪] চটকা চটুল ভাব ও ভাঁজহীন লঘু সুরের গান— পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সুরের তত্ত্বগত সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণে না গিয়ে প্রকৃতিগত পরিচিতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা যাক। মুস্তাফা জামান আব্বাসী বলেছেন,

> ভাওয়াইয়া বহুদূর শৈশবের ভেসে আসা বিমূর্ত কান্নার সুর। ভাব থেকে এর উৎপত্তি, না সুর থেকে এর ভাবে সম্প্রসারণ— জানি না। মনে হয় যেন তা খরস্রোতা কালজানি, তোরষা ও ধরলা নদীর কলধ্বনির সঙ্গে মইষালি দোতরার কানাকানির একাত্ম হয়ে ওঠা। কখনো নারীর বিরহানুভূতিগুলো উত্তরাঞ্চলের কথ্যভাষার ঢঙে ও দোতরার ডাং-এ মাখামাখি করে মিলন ঘটিয়েছে কোনো বিস্মৃত অতীতে। যখন চড়া গলার গীদাল (গায়ক) আদি ও অকৃত্রিম রসধারার স্রোতে প্লাবন আনেন, তখন তা ভাবনার জন্ম দেয়।[১৫]

ভাওয়াইয়া গানের ভাষা এবং সুর বিষয়ে স্পষ্টত বলা যায়— উত্তরাঞ্চলের তথা রংপুর-দিনাজপুর-কোচবিহারের উপভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, উচ্চারণরীতি প্রভৃতির সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের কথার ও সুরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভাওয়াইয়া গান যেন উক্ত অঞ্চলবিশেষের জনজীবন, ভূ-প্রকৃতি ও ভাষারীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বন্ধনে জড়িত। যে বন্ধন ছিন্ন করে এই গান অন্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য,

ময়মনসিংহ ও সিলেটে প্রচলিত ঘাটু গানের বিষয়বস্তু লৌকিকপ্রেম, রাজশাহী-মুর্শিদাবাদে প্রচলিত আলকাপ গানের বিষয়বস্তুও তাই। কিন্তু ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে ভাওয়াইয়া বা আলকাপ গান যেমন রচনা করা যায় না, অনুরূপ রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে ভাওয়াইয়া বা ঘাটু গান রচনা করা যায় না। একইভাবে অন্য অঞ্চলের ভাষারীতি ও উচ্চারণভঙ্গি দ্বারা ভাওয়াইয়া গান বাঁধা ও সুর তোলা সম্ভব নয়।

চ. ভাওয়াইয়া গানে নদী প্রসঙ্গ

সমস্ত ভাওয়াইয়া গানের ভাব ও বিষয় প্রায় অভিন্ন— লৌকিক জীবনাশ্রয়ী প্রেম ও বিরহ। কিন্তু ভিন্নতা রয়েছে গান গাওয়ার পরিবেশে, গানের নায়ক-গায়কের পেশা ও পেশাগত অবস্থানে। মাহুত, মইষাল, রাখাল, গাড়িয়াল, শিকারী, বৈদ্য, বাউদিয়াসহ আরও কত কী— যাদের পেশা অবস্থান বিভিন্ন ধরনের। কেউ অরণ্যে, কেউ বাথানে; কেউ মাঠে, নির্জন প্রান্তরে, কেউ বা ধুলিময় সড়কে। ভাওয়াইয়া গান মুখ্যত স্থল-কেন্দ্রিক। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর-রংপুরের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলা, অসমতল, পতিত ঊষর ভূমি; কিংবা উর্বর সমতল ভূমি। যেখানে যাতায়াতের প্রধান বাহন গরুর গাড়ি, জীবিকার প্রধান উৎস কৃষিকর্ম। এ অঞ্চলে খুব বড় নদী নেই। যেগুলি আছে কেবল বর্ষাকালে উজানের প্রবাহ পেলে খরস্রোতা হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় সবগুলিতে মরা নদীর স্রোত অথবা চর। তোরষা, তিস্তা, ধরলা, ক্ষীরল, করতোয়া, মানসাই, আত্রাই, কালজানি, রায়ঢাক, মহানন্দা এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত নদী। রংপুর জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থান ব্রহ্মপুত্র তথা যমুনা নদীর। সুতরাং নদী যেহেতু আছে; নদীসম্পর্কিত গানও থাকা স্বাভাবিক। ভাওয়াইয়া গানের নাইয়ারা এসব নদীতে নৌকা ভাসায়; খেয়াঘাটে মানুষ পারাপার করে, কিংবা মালামাল পরিবহণ করে দূরবর্তী স্থানে। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে গমনকারী মাঝি-মাল্লাদের দিনের পর দিন প্রিয়জন ছেড়ে দূরে অবস্থান করতে হয়। অন্যদিকে খেয়াঘাটের পাটুনী। কাজের অবসরে, বিষণ্ন মুহূর্তে এরা নৌকায় বসে বিরহের সুর তোলে কণ্ঠে। এমনি প্রসঙ্গ ও অবস্থানগত সূত্র ধরে বিশেষ পেশাজীবী শ্রেণি হিসেবে নদীসংলগ্ন নাইয়া-মাঝিরাও নায়করূপে উঠে এসেছে ভাওয়াইয়া গানে। অবশ্য মাঝি-মাল্লা ছাড়াও গানে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে— তবে তা অন্য ভাবে, অন্য পরিচয়ে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে— ভাওয়াইয়ার প্রায় সব গানেই নারী-হৃদয়ের আর্তি তথা প্রেমবাসনা, মিলনাকাঙ্ক্ষা, বিরহ-যাতনা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটেছে। কোনো কোনো গানে নারীর সম্বোধনে কানাই বা কালা-এর উপস্থিতি রয়েছে। যে পৌরাণিক কানাই যমুনায় ব্রজগোপিনীদের পার করতেন। তবে এখানে পারাপারকারী কানাই কিন্তু ব্রজের কানাই নন; গ্রাম-বাংলারই কোনো পল্লিযুবক। আর পার হতে চাওয়া নারী সাধারণ ঘরের কৃষক-কন্যা। নদী পার হয়ে মথুরার হাটে কেনা-বেচার জন্য যেতেন গোপিনীগণ, আর এই মেয়ে পার হয় ও-পারের ফসলের জমিতে কর্মরত বাবার নিকট খাবার নিয়ে কিংবা আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বিক্রির জন্য নেয়া দুগ্ধ-দধিপূর্ণ ভাণ্ড ছিল গোপিনীদের মাথায়, আর পল্লিকুমারীর বুকের মাঝে রয়েছে প্রেমপূর্ণ হৃদয়। নিচের গানটিতে—

ও কি কানাই রে,
কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে।
অখুটা[১] শিমিলার নাও

বৈঠায় না ধরে বাও রে,
ও হো কানাই রে, কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে ॥

যে নাইয়া করিবে পার,
তাক দিমো আমি গলার চন্দ্রহার রে,
ও হো পার করিলে মুই নারী তোমার রে ॥

এলুয়া কাশিয়ার ফুল,
নদী হইল কানাই হুলুস্থুল রে,
ও কি কানাই রে, পার করিলে যৈবন করিমো দান রে ॥[১৬]
(১. অখুটা- খারাপ বা দুর্বল কাঠ)

এখানে শিমুলের মতো নিম্নমানের কাঠ দিয়ে তৈরি কানাইয়ের দুর্বল নৌকায় উত্তাল নদীতে পার হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে নির্ভরতা— দুর্বল নৌকার শক্ত-সামর্থ মাঝি কানাই, যাকে মেয়েটি ভালবাসতে চায়। পারের বিনিময়ে গলার চন্দ্রহার দিতে চায়। জীবন-সঙ্গী করে দেহ-মন-যৌবন বিলিয়ে দিতে চায়। ভাওয়াইয়া গানে নারীর অসঙ্কোচ আত্মসমর্পণের এমন প্রস্তাব সত্যিই বিস্মিত করে। প্রায় একই ভাবের নিচের গানটিতে ঘাটে কানাই বা তার নৌকা না থাকায় অস্থিরতার প্রকাশ রয়েছে। শাড়িপরিহিত যৌবনাগমে উচ্ছল যুবতি উদ্দাম হাওয়ায় বার বার উদলা হয়ে পড়ে। বর্ষা-প্রকৃতির বিরূপতায় আতঙ্কিত হয়। উপরন্তু যাকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত-নির্ভর ভাবীজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, জীবন-তরীর শক্ত মাঝি হিসেবে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছিল— সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ 'সোনার কানাই' কিংবা তার নৌকাটি ঘাটে নেই। এক অজানা আশঙ্কায় মেয়েটি যেন হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

ওরে আষাঢ় শাওন মাসে
দেওয়া ঝরে কানাই মধু রসে রে
হায়রে, বুকের বসন মোর হাওয়ায় ধরিয়া টানে ॥

আকাশে বিজলির হানা
বুক হইল মোর ফানা ফানা রে
হায়রে, কেমন করিয়া দরিয়া হব পার ॥

পুবাল-পশ্চাত্যের বাও
খেওয়া ঘাটে কানাই, নাই তোর নাও রে
হায়রে, সোনার কানাই মোর কী হবে উপায় রে ॥ [১৭]

বিরহজনিত প্রেমের বেদনা-হতাশার প্রতিফলন ঘটে সাধারণ ভাওয়াইয়া গানে। অন্যদিকে চটকা জাতীয় ভাওয়াইয়া গানে প্রতিফলিত হয় মিলনাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রেমের আর্তি-আকুলতা। ভাওয়াইয়া একক কণ্ঠের গান হলেও চটকা একক, দ্বৈত উভয় কণ্ঠেই গাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বৈতকণ্ঠের গান নদী-কেন্দ্রিক চটকা গানে লক্ষ্য করা যায়, যা স্থল-কেন্দ্রিক ভাওয়াইয়াতে কার্যত দুর্লভ। এ জাতীয় দু'টি গানে উত্তরবঙ্গের রাই-কানাই'এর

বক্তব্য তুলে ধরা যাক। 'রাই'-এর উল্লেখ কোথাও নেই। কানাই-এর সঙ্গে মানানসই বলে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.

কানাই: ওরে আগা নাওয়ে ডুবডুব, পাছা নাওয়ে বইস।
ঢোঙ্গায়[১] ঢোঙ্গায় ছ্যাকোং জল রে,
ও কন্যা, পাছা নাওয়ে বইস ॥
ওরে, জল ছেঁকিতে জল ছেঁকিতে সেঁউতির ছিঁড়িল দড়ি।
গলার হার খসেয়া কন্যা হে,
ও কন্যা, সেঁউতিত লাগাইম্ দড়ি ॥

রাই: ওরে তোক সে বলোং ছাওয়াল কানাই,
তোর সে ভাঙ্গা নাও।
ভাঙ্গা নাওয়ের খ্যাওয়া দিয়া হে,
ও তুই কেমন মজা পাও ॥

কানাই: ওরে ভাঙ্গাও নোয়ায়[২] জোড়াও নোয়ায় সোনা-রূপায় গড়া,
রাজার হস্তিক পার করিচোং রে
ও কন্যা তোর বা কত ভরা ॥[১৮]

(১. ঢোঙ্গা- পানি সেঁচার পাত্রবিশেষ, ২. নোয়ায়- নয়)

২.

রাই: দ্যাওয়ায়[১] কর‍্যাছে ম্যাঘ-ম্যাঘালি তোলাইল্ পুবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে, ও তুমি ধীরে ক্যানে বাও।
হাড়িয়া ম্যাঘা কুড়িয়া ম্যাঘা হাড়িয়া ম্যাঘার নাতি,
গিসসি[২] আইসে দ্যাওয়ার ঝড়ি হে।
ও দ্যাওয়া তোলাইল্ পুবাল বাও, ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে ॥

কানাই: হাঙ্গর কুমীর বন্দু আমার নদীক কিসের ভয়,
সান্তারিয়া দরিয়া হব পার।
কালা শাড়ি পেন্দনে চাঁদ তোর ভোগধান বাসায়[৩] গাও,
শোনেক শোনেক সোনার কন্যা হে।
ও কন্যা, নাওয়ে দিছেন পাও, এখন তুমি কিসের ভয় বা পাও ॥

রাই: তুমি তো সুজন ওরে নাইয়া আমার কথা শোনো,
শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে।
ও নৌকা তলায় জলের ভারে, শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে ॥

কানাই: শিমুলও নোয়ায়, সেগুনও নোয়ায়, মন পবনের নাও,
সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিচোং হে।
ও কন্যা যদি সাথে রও, ভয় না করি তিস্তা নদীর ঝড় ॥
ওরে গগন কালা, কালা শাড়ি, কালা পানির ঢেউ,
কালায় কালায় কালা হইল হে।
ও কন্যা, আমার ভাটির নাও, ধীরে চল সোনার নৌকা হে ॥

রাই: শোনেক নাইয়া ভাটির নাইয়া বলোঁ তোমার আগে,
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু হে।
ও বন্ধু কালায় কালাক দেখোং, তুমি আমার প্রাণের কালা হে ॥

কানাই: ভাটির নাও মোর ভাটি চল, নাওয়ে সোনার ধন,
ধীরে চল ধীরে চল হে।
ও নৌকা তীরে আমার ঘর, ধীরে চল সোনার নৌকা হে ॥ [১৯]
(১. দ্যাওয়ায়- আকাশে, ২. গিসসি- গ্রীষ্ম কালে, ৩. বাসায়- সুবাস ছড়ায়)

গানের কথপোকথনে নৌকায় পার হওয়া, আসন্ন ঝঞ্ঝায় যুবতির নৌকাডুবির আশঙ্কা, যুবক মাঝির অভয়দান প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। প্রথম গানে কানাইয়ের খেয়া নৌকার দুরবস্থায় যুবতি বিরক্তি প্রকাশ করে। নৌকার সামনে-পেছনে যেখানেই বসতে যায় শরীরের ভারে দেবে গিয়ে ভেতরে জল ঢোকে। জল সেঁচতে সেঁচতে সেঁউতির রশি পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। আবার রসিকতা করে কানাই ওর গলার হার থেকে সুতা খসিয়ে সেঁউতিতে লাগানোর কথা বলে। এতে কপট রাগও দেখায় মেয়েটি, দুর্বল কাঠের জীর্ণপ্রায় এতো ছোট নৌকায় খেয়াপারের প্রসঙ্গ তোলে। মাঝিরও কৌতুকপূর্ণ ঠোঁট-কাটা উত্তর— রাজার কত বড় বড় হাতিকে সে এই নৌকায় পার করে, অথচ একরত্তি এই মেয়ে— যে কি-না সোনা-রূপা দিয়ে তৈরি তার এমন চমৎকার নৌকায় পার হতে ভয় পায়। আবার অন্য মেয়েদের পয়সার বিনিময়ে পার করলেও একে বলে— 'তোক সুন্দরীক পার করিতে খসাইম্ কানের সোনা।' দ্বিতীয় গানে মেয়েটি মাঝিকে নৌকা দ্রুত বাওয়ার জন্য বলে। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, ঝড় আসার পূর্বেই তীরে পৌঁছুতে হবে। এমনিতেই দুর্বল কাঠের ছিদ্রযুক্ত জলঢোকা নৌকা, তার উপর কালবৈশাখীর আঘাতে নির্ঘাত তলিয়ে যাবে। সে নিজের কিংবা 'প্রাণের কালা' কারো অকালে অপমৃত্যু চায় না। কালার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে আজীবন তার কালো রূপ উপভোগ করতে চায়। কিন্তু রাইয়ের উদ্বেগ সত্ত্বেও নির্বিকার কানাই ধীরে ধীরে নৌকা বায়। মেয়েটিকে নির্ভয় দেয়, সাহস জোগায়। ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা যদি ডুবেও যায়, তাতে ভয়ের কিছু নেই; তাকে নিয়েই কানাই 'সান্তারিয়া' দরিয়া হবে পার। হাঙ্গর-কুমীরের সঙ্গে সখ্য আছে, সুতরাং ওদের থেকে ভয় নেই। বাসিত দেহের, কালো রঙের শাড়ি পরিহিত অপরূপ 'সোনার ধন' যখন থেকে নৌকায় পা দিয়েছে, তখন থেকে সে কানাইয়ের আত্মার আত্মীয় হয়ে গেছে। তার সমস্ত দায় কানাই নিজের করে নিয়েছে। মেয়েটি সঙ্গী হলে এই 'মন পবনের নাও'-এ কানাই সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে, সামান্য তিস্তা নদীর বাহিতব্য ঝড় এমন আর কী। গানে পারস্পরিক কথনে দুটি যুবক যুবতির আন্তরিকতার অকপট প্রকাশ, নায়কের হালকা রসিকতা অথচ জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি এবং উপভোগ্য করার আকাঙ্ক্ষা ব্যতিক্রমী মনে হয়।

অনেক ভাওয়াইয়া গানে বিবাহ-পূর্ব কুমারী মেয়ের প্রেমের আকুতি লক্ষণীয়, আবার বিবাহোত্তর বিচ্ছেদজনিত বিরহের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। জনৈক প্রোষিতভর্তৃকা দীর্ঘ সময়

প্রিয়সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে ক্রমেই উতলা হয়ে ওঠে। জীবিকার প্রয়োজনে প্রিয়জন বাণিজ্যে গেছে উজানের দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে। ব্যাপারটি স্বাভাবিক, তবুও মন মানে না। জীবনসঙ্গীর প্রত্যাবর্তনে অনিশ্চয়তা কিংবা বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় অস্থির হয়। তার পতিধন অন্য কোনো নারীর করায়ত্ত হয়ে গেছে কি-না কে জানে। জনশ্রুতি রয়েছে, সেই অঞ্চলের মেয়েরা এতই মনোরঞ্জনপটীয়সী যে, পুরুষেরা সহজেই তাদের প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে যায়। বহুদিন স্বামী বিদেশে থাকায় কত জন কত কথা বলে, নীরবে সব সহ্য করতে হয়। মাঝে-মধ্যে ছুটে যায় নিকটবর্তী তোরষা নদীর পাড়ে। ধাবমান নৌকা দেখে আশান্বিত হয়— এই নৌকাতে হয়তো তার দয়িত রয়েছে। কিন্তু আশাহত হতে হয়। প্রেমহীনা হয়ে কীভাবে সময় কাটে। সঙ্গীহীন বিছানায় শুয়ে ছটফট করে কেবল। ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। কত কথা মনে জাগে, কিন্তু কার নিকট বলবে সে সব অব্যক্ত কথা:

তোরষা নদী উতাল পাতাল, কার বা চলে নাও
সোনা বন্ধুর বাদে[১] রে মোর কেমন করে গাও রে
তোরষা নদী উতাল পাতাল রে ॥

বন্ধুয়া মোর বাণিজ গেইচে উজানিয়ার দ্যাশে,
সেই না দ্যাশে পুরুষ বান্ধা পড়ে নারীর ক্যাশে রে
নানান জনের নানান কথা শুনং না কওঁ রাও ॥

একনা তারা দুকনারে তারা, তারা ঝিলমিল করে
এমন মজার রাতি যায় রে, মনো না রয় ঘরে রে,
মনোতে মোর লক্ষ রে কথা, কার বা আগে[২] কওঁ ॥[২০]
(১. বাদে- জন্য, ২. আগে- নিকট)

উপরের গানে বাণিজ্য উপলক্ষে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে থাকা জনৈক বানিয়া স্বামী বহুদিন ফিরে না আসায় বিরহ-কাতর স্ত্রীর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিচের গানটির নায়ক নাইয়া। যে তার স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে একেবারে চলে গেছে। শরাঘাতের দুঃসহ যন্ত্রণায় মেয়েটি সর্বক্ষণ ছটফট করে। পুনরায় যদি নাইয়ার নাগাল পায়, কখনো ছেড়ে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। পূর্বেই যদি টের পেত প্রিয়তম এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে, প্রয়োজনে কোলের বাচ্চা ফেলে দিয়ে হলেও তাকে বেঁধে রাখতো। হয়তো বা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ে স্বস্তির অন্বেষায় সে কানাই নামের আরেকজন পাটুনীর নিকট কষ্টের অনুভূতি প্রকাশ করে। তরঙ্গ অভিঘাতে উত্তাল নিজের যৌবনরূপ নদীতে পারে সম্মত হলে পারানি হিসেবে গলার হার দিতে চায়। মূলত প্রণয়বঞ্চিত বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষের নিকট সর্বস্ব সমর্পণের অসঙ্কোচ প্রস্তাব এ গানের সুর। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি হয়তো সামাজিক নয়, কিন্তু যথার্থই যে মানবিক— তা বলা যায়।

সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইচে ছাড়িয়া রে ॥
কী বাণ মারিলে নারীর হৃদয় চাহিয়া।

এলুয়া কাশিয়ার ফুল,
নদী হইল কানাই হুলুস্থূল রে।
যে নাইয়ায় করিবে পার
তাক দেইম্ গলার হার রে॥

যদি বন্দুর নাগাইল পাওঁ
ছাড়িয়া দিবার নওঁ রে
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইচে ফাঁকি দিয়া রে॥

আগে যদি জানতাম বন্দুরে যাইবেন চাড়িয়া,
কোলের ছাওয়া ফ্যালে দিয়া আকিতাম[১] বান্দিয়া রে
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইচে ছাড়িয়া রে॥[২১]
(১. আকিতাম- রাখিতাম)

স্বামী-পরিত্যক্ত অবস্থায় কিংবা স্বামী দূর দেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করায় নারী-হৃদয়ের আর্তনাদ স্বাভাবিক। প্রিয়সঙ্গ বঞ্চিত নারী মনোযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। কখনো অন্যের নিকট তার অসঙ্কোচ প্রকাশ করে, কখনো বা একাকী ছটফট করে। স্বামী বর্তমান সত্ত্বেও দাম্পত্যজীবনে অসুখী-অতৃপ্ত কিংবা সংক্ষুব্ধ নারীর অন্য পুরুষের নিকট প্রেম নিবেদন, মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ অনেক ভাওয়াইয়া গানে বিদ্যমান। নদীসম্পর্কিত একটি গানে পরকীয় প্রেমের রূপায়ণ এমন—

এ পারে আমার বাড়ি, ও পারে বন্ধুর বাড়ি,
মইদ্যে হইল ক্ষীরল নদীর খ্যাওয়া।
ওরে কাজল ভোমরা গরুর রাখোয়াল রে,
মুই নারী কোলে বাচ্চা ছাওয়া॥

না জানোং সাঁতার, না জানোং পংরিবার,
না জানোং ভুরা[১] বহিবারে।
ওরে আগম[২] দরিয়ার মাঝে কে দিবে খ্যাওয়া রে,
আমি নারী ক্যামনে দিব পাড়ি॥

বালুতে রান্ধিনু, বালুতে বাড়িনু,
জলে ভাসেয়া দিনু হাঁড়ি।
ওরে বিহ্যার সোয়ামি মইলে মাছ-ভাত মুই খাইম্
বন্ধু তুমি মরিলে হব আঁড়ি॥[২২]
(১. ভুরা- ভেলা, ২. আগম- অগম্য, বিপজ্জনক, ৩. আঁড়ি<রাঁড়ি- বিধবা)

উপরের গানের নায়ক রাখাল, যার বাড়ি ক্ষীরল নদীর ও-পারে। নদীর ধারে নিত্যই সে গরুর পাল ছেড়ে দেয়। এ-পারের কুলবধূ ও-পারের গরুর রাখাল 'কাজল ভোমরা'-কে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু কোলের শিশু নিয়ে ক্ষীরল নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। সাঁতার কিংবা ভেলা বাওয়া— কোনোটিই সে জানে না, সুতরাং

বিপজ্জনক নদী পার হয়ে সে তার কাঙ্ক্ষিতের সান্নিধ্য পাওয়ার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে। বন্ধু-বিহনে রান্না-বান্নাসহ সাংসারিক কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। হৃদয়-মন জুড়ে শয়নে-স্বপনে-সর্বক্ষণে উপস্থিতি কেবল রাখালের, রাখালই জীবনসর্বস্ব। তাই তো মেয়েটির অকপট স্বীকারোক্তি— বিয়ের স্বামীর মৃত্যুর পর সে বৈধব্য মানবে না, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়াসহ সব বিষয়ে সধবা নারীর মতো চলবে, কিন্তু রাখাল বন্ধুর মৃত্যুর পরই সত্যিকার বিধবা হবে।

নিচের গানে আরেক জন বিবাহিত মেয়ের আকুতির পরিস্ফুটন লক্ষণীয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর স্বামীর ঘর করতে যাবে— এমন শর্তে পিতা-মাতা হয়তো শখ করে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। মেয়ে এখন পূর্ণ যুবতি; স্বামীর সঙ্গ-সুখ পেতে সর্বক্ষণ উদগ্রীব হয়ে থাকে যার দেহ-মন, কিন্তু তারা সেটি বুঝতে চায় না। শ্বশুর নিতে আসলে মেয়ে তাদের 'বাচ্চারে ছাওয়া' বলে বিদেয় করে, মেয়েকে কাছ-ছাড়া করতে রাজি হয় না। পিতা-মাতার এমন অন্ধ অপত্য-স্নেহ অসহনীয় মনে হয়। বাড়ির পার্শ্ববর্তী যমুনা নদী। যেখানে ছেলেরা খেলা-ধুলা করে, নদীর পানিতে লাফালাফি করে। অথচ তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় ঘাটে বাসন-পত্র ঘষা-মাজায়, গোসল শেষে বাড়ি এসে চুল শুকিয়ে খোঁপার পরিচর্যায় কিংবা সাংসারিক অন্য কাজে। শারীরিক-মানসিকভাবে কার্যত বন্দি মেয়েটি এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। বুক-ফাটা কষ্ট আর দমিয়ে রাখতে পারে না— এলাকারই জনৈক নাইয়ার নিকট মনের কষ্ট-গাথা তুলে ধরে। ছুটে যেতে চায় প্রিয়জনের নিকট, প্রিয়সান্নিধ্যে তৃপ্ত করতে চায় হৃদয়-মন।

ওরে নাইয়া ভাই।
বাড়ির কাচে যবুনা রে নদী,
সদাই ছাইলা কোলায়[১] হে দ্যাকি,
সদাই মন মোর বারে যাওঁ বারে যাওঁ করে॥

নদীর পারে ঘষোণ হে মাঞ্জন,
বাড়িত আইলে কইন্যার খোপার যত্তোন,
সদাই মন মোর বারে যাওঁ বারে যাওঁ করে॥

বাপো মায়ের এমনি ময়া,
নিবার আইলে কয় বাচ্চারে ছাওয়া,
চিরিল শাড়ি মোর যৈবনের ভারে রে।
সদাই মন মোর বারে যাওঁ বারে যাওঁ করে॥

শ্বশুর আইল নিবার বুলি,
ফিরি গেল তাঁই নদীর ঢেউ দ্যাকি,
সদাই মন মোর বারে যাওঁ বারে যাওঁ করে॥[২৩]
(১. কোলায়- লাফ-ঝাঁপ দেয়)

নদীর তীরবর্তী লোকালয়ে বসবাস, নিত্যই যেতে হয় নদীর ঘাটে। মাঝিরা নৌকার পাল তুলে হালে বসে হয়তো মনের সুখে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। জনৈক মাঝিকে কোনো এক মেয়ে তাদের কমলা সুন্দরীর ঘাটে নৌকা ভিড়াতে বলে। নদীর পাড়ের মতো ভগ্নমান ব্যথিত হৃদয়ের কথা শোনায়। যৌবনভারে উথলিত দেহ-মন, কিন্তু কেন জানি এ যাবৎ কাউকে সাহস করে মনের কথা বলতে পারেনি। নিজের 'যৌবনের ব্যাপারী' হিসেবে কাউরো সন্ধানও পায়নি। নায়ের কাণ্ডারি মাঝিকে অকৃতদার জেনে মেয়েটি পরোক্ষভাবে নিজের যৌবন-নদীর কাণ্ডারি হওয়ার প্রস্তাব দেয়।

নাইয়া রে—
চাপাও নৌকা কমলা সুন্দরীর ঘাটে রে।

নাও বাইয়া যাও নাইয়া রে
তোর সে মনের সুখ,
ওরে নায়ের বাদাম তুলিয়া নাইয়া রে
দেখাও চান্দ মুখ রে॥

মনে বড় দুখ নাইয়া রে, চিত্তে বড় দুখ,
ওরে নদীর পাহাড়ের মতো
ভাঙ্গে নারীর বুক রে॥

নদীর মাঝে থাকো নাইয়া রে, নায়ের কাণ্ডারি,
ওরে অভাগিনী নারীর নাই রে নাইয়া
যৈবনের ব্যাপারী রে॥ [২৪]

একই পথে আসা-যাওয়ায় মেয়েটির সঙ্গে হয়তো প্রায় সাক্ষাৎ ঘটে, কথা হয় মাঝির। একসময় সম্পর্ক গভীর হয়। সরিষাফুল রঙের, মেঘবরণ কেশের, অপরূপা, উচ্ছল যৌবনা মাঝির হৃদয় জয়ে সক্ষম হয়। মেয়েটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাঝি তাকে নিজের ঘরনি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সঙ্গে করে বাড়ি নেওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করতে বলে। চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন-জনের মালিক মাঝি মেয়েটিকে নিজের হৃদয়-রাজ্যের রাণি করে, সম্পদে-সুখে ভাবী দাম্পত্য-জীবন অতিবাহনের গল্প শোনায়ঃ

নৌকায় চড়ো নৌকায় চড়ো রে কইন্যা,
চলো আমার বাড়ি।
উজানে আমার বাড়ি রে কইন্যা,
ভাটি বাণিজ করি রে কইন্যা, নৌকায় চড়ো॥

রূপ দেখোঁ তোর সরিষার ফুল রে কইন্যা,
যৈবন যায় রে ভাটি।
হাড়িয়া মেঘ যেমন মাথার চুল রে কইন্যা,
আমার পরাণ নিলেন হরিয়া রে কইন্যা, নৌকায় চড়ো॥

চইদ্দ ডিঙ্গা ধন-জন রে কইন্যা,
সব হবে রে তোমার।
আমার রাজ্যের রাণি হইবেন রে কইন্যা,
তোমার জনম যাবে সুখে রে কইন্যা, নৌকায় চড়ো॥[২৫]

দাম্পত্য জীবনেও ঘটতে পারে ভয়াল কোনো পরিণতি। হাজারো স্বপ্ন দিয়ে, প্রেম দিয়ে রচিত সুখের বাসর আকস্মিক দুর্বিপাকে নিমেষেই ধূলিসাৎ হতে পারে। সেটির কারণ দম্পতি নিজেরাই কিংবা হতে পারে অন্য কেউ। ভাওয়াইয়ার বহু গানে নায়ক-নায়িকার পরকীয়া কিংবা পরকীয় প্রেমের উল্লেখ রয়েছে। আবার কোথাও নায়ক দীর্ঘ দিন প্রবাসে অবস্থান করেছে, কোথাও বা স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ করে একেবারেই চলে গেছে। অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেম পারিবারিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। দুটি নর-নারীর অটুট সম্পর্কের ভিত্তিমূলের প্রধান নিয়ামক। এ দিয়ে মানুষ ইহলোকে শান্তি-সুখের অমরাবতী রচনা করতে পারে, অন্যদিকে তার অভাবে কখনো বা দুর্বিষহ জীবনে ভোগ করে নরক-যন্ত্রণা। বেদনাহত প্রেমের ভক্ত ভাওয়াইয়া-গীতিকারগণ এই প্রেমের উচ্চারণ করেছেন। উল্লেখ্য, তাদের গানে এমন প্রেম মনুষ্যলোকের সীমা ছাড়িয়ে অন্য প্রাণীর মধ্যেও ব্যাপ্তিলাভ করেছে। নিচের বহুল পরিচিত একটি গানে বগার অত্যাসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় বগা-বগীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আর্তনাদ কী পরিমাণ মর্মস্পর্শী— তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।
ফাঁদ বসাইছে ফান্দি রে ভাই, পুঁটিমাছ দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা বগায় পড়ে উড়াল দিয়া রে॥

ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা
ওরে আহা রে কুঙ্কুরার সুতা, হলু লোহার গুণা রে॥

ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায় রে হায়,
ওরে আহা রে দারণ বিধি, সাথী ছাইড়া যায় রে॥

আর বগা আহার করে আশে আরও পাশে
আমার বগা আহার করে ধল্লা নদীর পারে রে॥

উড়িয়া যায় চকোয়া রে পঙ্খি বগীক বলে ঠারে
ওরে তোমার বগা বন্দি হইছে ধল্লা নদীর পারে রে॥

এই কথা শুনিয়া রে বগী দুই পাখা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পারে যাইয়া দরশন দিল রে॥

বগাক দেখিয়া বগী কান্দে রে
বগীক দেখিয়া বগা কান্দে রে॥[২৬]

গানে বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর কিংবা ভুসুকুপা'র হরিণ-হরিণার ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এটি কেবল গানই নয়; অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবি ধরলা নদীর বাঁকে নিষ্পাপ বগা-বগীর ট্র্যাজিডির রূপকে বাঙালি জায়া-পতির যে চিত্রকল্প এঁকেছেন— তাতে গানটি মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। এতে রূপকের মাধ্যমে ধনিক শ্রেণি দ্বারা সাধারণ মানুষের নিপীড়নের কাহিনী বিবৃত হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কেউ বা বৃটিশ শাসকদের সমসাময়িক অন্যায়-অবিচার এবং নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে বলেও মনে করেন। খাদ্যের অন্বেষণে ধরলা নদীর পারে গিয়ে ফাঁদে জড়িয়ে বগার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে দূর-দেশে গিয়ে মানুষ বিপদাপন্ন হয়ে জীবন হারাতে পারে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তার প্রিয়জনদের জন্য কত যে মর্মান্তিক হয়— তা কেবল ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করে।

জাগতিক জীবনে মানুষ স্বপ্ন-সুখ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি নিয়ে আনন্দে বেঁচে থাকতে চায়। হাজারো প্রাচুর্যের মধ্যে সেই আনন্দ থাকবে— এমন কথা নয়। বরং কখনো সাধারণ মানুষ অতি সাধারণ বিষয়ের মধ্যেও আনন্দের সন্ধান পায়। জনৈক গৃহী (নদীলগ্ন মানুষ, মাঝিও হতে পারে) কালজানি নদীর তীরে প্রিয়জনকে নিয়ে স্বপ্ন-সুখের ক্ষুদ্র এক স্বর্গোদ্যান তৈরি করেছিল। মস্ত কোন প্রত্যাশা ছিল না; মাথা গোঁজার একটুখানি আশ্রয়সহ আর যা ছিল, তাই নিয়ে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু সর্বনাশী কালজানি তার সেই স্বপ্নময়, আনন্দময় জীবনে অকস্মাৎ ছেদ এঁকে দেয়। নদীর ভয়াল থাবায় বাস্তুহারা হয়, হারায় সর্বস্ব। ভগ্ন-হৃদয়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সর্বহারা মানুষটির হৃদয়-পটে মাঝে-মধ্যে ভেসে ওঠা স্মৃতিময় বর্ণিল অতীতের উচ্চারণ এ রকম—

ও মোর কালজানি নদী রে
থাকি থাকি ক্যানে তোর কথা আজি মনে পড়ে।

নদীর কাছাড়োত[১] রে মোর হোগলা দেয়া বাড়ি
কলজার টুকরার মতো ছিলুঁ[২] জুড়ি রে
হায়রে, সেই না ঘর মোর নিয়া গেলু তুই কাড়ি ॥

এলুয়া কাশিয়ার ফুল মোর কাইঞ্চা বাড়ির শোভা
বাঁশের বেড়া দিয়া ঘর মোর করনু মনোলোভা রে
হায়রে, সেই না বাড়ি মোর ভাসিল রে তোর কাদো-জলে ॥

আগদুর বাড়িত দিনু রে মুই চাঁপাকলার ঝাড় রে
গোলাপ-চাঁপার গাছে ভৈ ভৈ হইল চারিধার রে
হায়রে, সেই না বাড়ি মোর নিয়া গেলু তুই কাড়ি ॥

সব নিলি তুই সর্বনাশী
বাড়ি-ঘর গেইচে মোকও নে আসি রে

হায়রে, আজি তোর পানিত মিটাই সকল জ্বালা রে ॥[২৭]
(১. কাছাড়োত- নদীর তীরে, ২. ছিলুঁ- ছিলাম)

নদীর তীরে হোগলার ছাউনি দিয়ে তৈরি বাড়ি, যা ছিল কলিজার টুকরার মতো পছন্দনীয়; নদী তা কেড়ে নিয়েছে। বাঁশের বেড়ার কাঁচা বাড়ির মনলোভা সৌন্দর্য হাজার গুণ বাড়িয়েছিল চার পাশের শোভনীয় এলুয়া কাশিয়ার ফুল। চাঁপাকলার ঝাড় ছিল, ছিল গোলাপ-চাঁপার ফুলও— যে ফুলের সুবাসে চারিদিক 'ভৈ ভৈ' করত সর্বক্ষণ। এমন সৌরভময়, সৌন্দর্যময় বাড়ি কি-না ভেসে গেছে নদীর বিশ্রী কাদা-জলে। স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে যাওয়া, প্রিয়জন-হারা যন্ত্রণাকর জীবন বয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য সে মৃত্যু কামনা করে। নদী যেহেতু তার সমস্ত কেড়ে নিয়েছে, সেহেতু তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে; সুতরাং নদী যেন তাকেও নিয়ে নেয়। মূলত নদীবহুল বাংলাদেশে নদী-পারের মানুষ নদীর দ্বারা কী ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়— গানটিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

একটি অঞ্চলবিশেষের ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ, জাতি ও সমাজ, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তথা আঞ্চলিকতার প্রভাবপুষ্ট হয়েও চিরন্তন মানবিকতার স্মারক হিসেবে ভাওয়াইয়া গান সর্বাঞ্চলীয় এবং সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম— অসংখ্য গানের সমারোহে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে এমন কিছু গানের মধ্যেও সে কথার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আলোচিত গানগুলিতে একান্তই লৌকিক জীবনাশ্রয়ী প্রেম ও বিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। গানের নায়ক নাইয়া-মাঝি, রাখাল কিংবা তাদের প্রেম-সঙ্গ প্রত্যাশী নায়িকারা সবাই এখানে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে যাদের চিত্ত নিরন্তর আন্দোলিত হয়। এখানে নির্মল প্রেম আছে, বঞ্চনা আছে। জীবনকে উপভোগ্য করার স্বপ্ন আছে, আবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও আছে। এখানে প্রিয়জনের অবর্তমানে বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে নারী, আবার স্বামীর বর্তমানেও পরকীয় প্রেমে যুক্ত হয়ে আত্মসুখ পেতে চেয়েছে। গানে প্রতিফলিত এমন সব বিষয় নিতান্তই মানবিক। জনৈক সমালোচকের কথায়—

> মানুষ অতিমানব নয়, তার জীবন কখনো অনাবশ্যক আদর্শায়িত হয়নি। এ প্রেম এখানে সত্য, এ জীবন এখানে সত্য, এ জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও মালিন্য সমানভাবে সত্য। মানুষ একে অবলম্বন করে বেঁচে আছে; অন্যদিকে এ ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা তার জীবনকে স্বাভাবিক ও সুন্দরের সত্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এ গানের আদর্শ হলো লোকায়ত, অবলম্বন হলো মানব জীবন এবং অনুভব হলো অশ্রুমুখী প্রেম ও বিরহ।[২৮]

অন্যদিকে নদীলগ্ন মানুষের জীবন-সমাজ-সংসারের পত্তনে মস্ত ভূমিকা রেখেছে নদী। তাদের জীবিকার অবলম্বন হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-বিবাহসহ বহু বিষয়ের সাক্ষী হয়েছে। নদী-জলের সঙ্গে আজীবন মিতালীর সম্পর্ক গড়ে নদীপাড়ের মানুষ মোহিত হয়েছে শান্তি-সুখের উল্লাসে, কখনো বা নদী-গর্ভে সর্বস্ব হারিয়ে করেছে মর্মন্তুদ আর্তনাদ। এমনিভাবে

মানুষের উন্নতি-দুর্গতি, আশা-নিরাশা, প্রেম-বিরহের স্বাক্ষরে বহমান রয়েছে ভাওয়াইয়া গানে উল্লিখিত নদী এবং দীপ্তিমান হয়ে রয়েছে গানের নায়ক-নায়িকারা।

তথ্যসূচি:

১. সুখবিলাস বর্মা: *ভাওয়াইয়ার সংজ্ঞা উৎপত্তি ক্রমবিকাশ*, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯, পৃ. ১১১

২. শামসুজ্জামান খান ও ড. মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত): *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১৩

৩. তদেব, পৃ. ১১২

৪. সুখবিলাস বর্মা: *ভাওয়াইয়ার সংজ্ঞা উৎপত্তি ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১১৭

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য: *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২৮৯

৬. শিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মণ্ডল: *কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত*, পুনর্মুদ্রণ- লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯, পৃ. ১১১

৭. ওয়াকিল আহমদ: *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, অগাস্ট ২০০৬, পৃ. ২৩৮

৮. ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল: *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, বইমেলা ২০০১, পৃ. ৬৬

৯. হরিশ্চন্দ্র পাল: *ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে*, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলিকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯, পৃ. ৭৯

১০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৬৯

১১. ওয়াকিল আহমদ: *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, পৃ. ২৪৬

১২. আব্বাসউদ্দীন আহমদ: *বাঙলার লোকসঙ্গীত*, বাংলা দেশের লোক-ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৮৫. পৃ. ৪৩৫

১৩. শ্রীগোবিন্দ হালদার: *বাংলা লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া*, সপ্তর্ষি, লোকসাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২; ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী: *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৩৪৮

১৪. রণজিৎ সিংহ: *মাটির সুরের খোঁজে*, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৭৫

১৫. মুস্তাফা জামান আব্বাসী: *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৫

১৬. ওয়াকিল আহমদ: *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, পৃ. ২৫৫

১৭. মুস্তাফা জামান আব্বাসী: *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, পৃ. ৩৪৪

১৮. আতোয়ার রহমান: *লোকসাহিত্যের কথা*, পৃ. ১৩০

১৯. মুস্তাফা জামান আব্বাসী: *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, পৃ. ৪৪

২০. তদেব, পৃ. ৮৯

[২১.] ওয়াকিল আহমদ: *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, পৃ. ২৬৬

[২২.] তদেব, পৃ. ৩০৪

[২৩.] তদেব, পৃ. ২৬৫

[২৪.] তদেব, পৃ. ২৬৬

[২৫.] তদেব, পৃ. ২৮৮

[২৬.] ড. আশরাফ সিদ্দিকী: *লোক-সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৩৯

[২৭.] মুস্তাফা জামান আব্বাসী: *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, পৃ. ৩৪৩

[২৮.] *লোকসাহিত্য*, একাদশ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ভূমিকা-৮; ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল: *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, বইমেলা ২০০১, পৃ. ৬৪